অন্তিম যাত্রা

তারাপদ হাজরা

অনিকেতদের মাটির বাড়িটা সেদিন হুড়মুড় করে ভেঙে পড়লো। ঝড় নেই, বৃষ্টি নেই, রৌদ্র-উজ্জ্বল দিনে মড় মড় করে মুদুনির কাঠটা ভাসএক গেল। অনিকেতের মা নিরঞ্জনা হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলেন—ওরে এ আমার কি হলো, ঘরটা ভেঙে গেল, হায় হায় রে, হায় হায়...।

মায়ের এমন মরা কান্না অনিকেতের একদম ভালো লাগেনি। নিরঞ্জনার হা-হুতাশে ততক্ষনে অনেক পড়শি জড়ো হয়েছে, তারাও ঘরটা ভেঙে যাওয়াতে এমন কান্নার জন্য হতবাক, মুখ চাওয়াওরি করছে। আর অনিকেতের মুখটা লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠছে, 'মা থামোতো! ভাঙা ঘরটা ভেঙে পড়েছে তো হয়েছেটা কী। ও ঘরটায় এখন তো কেউ থাকি না।' নিরঞ্জনার বুকের ভিতর যেন একটা ঝড় বয়ে যায়। যে ঝড়টা অনেকদিন থেকেই বইছিল। মনে হয়েছিল, হয়তো কোন একদিন অযত্নে পড়া থাকা বাড়িটা মাটির সাথে মিশে যাবে। কিন্তু এভাবে ভেঙে যাবে ভাবেনি।

গত কয়েকদিন আগেই নিরঞ্জনার বুকটা কেঁপে উঠেছিল। পশ্চিম দিক থেকে একটা দুরন্ত ঝড় গাছপালা কাঁপিয়ে ছুটে এসেছিল গ্রামের দিকে। বড় বড় গাছের ডাল ভেঙে গিয়েছিলো নিমেষে। একটা মস্ত আওয়াজ, গোঁ গোঁ শব্দ ভেসে যাচ্ছিলো রাস্তা দিয়ে। কাদের টিনের চালটা আছড়ে পড়েছিল ডোবার জলে। সেদিনই নিরঞ্জনা ভেবেছিল আজই বাড়িটা ভাঙবে, আজই মিশে যাবে মাটির সাথে। তারপর শুধু আজ জল। সবকিছু ঝাপসা। নিরাঞ্জনা নিশ্চিন্ত আজই বাড়িটা ভাঙবে...।

জল থেমে গেলেও বাতাস থামেনি। সারারাত সোঁ সোঁ শব্দ। লোডশডিং। কোথাও আলো নেই। ঘরের মধ্যে জ্বলছে চার্জার ল্যাম্প। নিরঞ্জন বার বার বলে, —'হাঁরে খোকা; ঘরটা পড়ে গেছে নারে।' অনিকেত বিরক্ত হয়। পড়লে কী হবে বলতো। তুমি কী ওখানে গিয়ে থাকবে না কী?

নিরঞ্জনা এখন পাকা বাড়িতে থাকে। অনিকেত বানিয়েছে। সে এখন ব্যবসা পত্তর করে। আয় মন্দ না। নতুন পাকা বাড়িটার পাশে ওই জীর্ণ বাড়িটা আর মানাচ্ছে না। কেমন হাড়গোড় ভাঙা মানুষের দেহের মতো বাঁশ বাতা দাঁত বের করে আছে। ওই ভাঙাচোরা বাড়িটার জন্য আসল বাড়িটার সৌন্দর্য কেমন মার খাচ্ছে। মনে মনে ভাবে অনিকেত, এত টাকা খরচা করে বাড়ি করলাম, সারা বাড়ি এশিয়ান পেইন্ট দিয়ে ওয়েদার প্রুফ করলাম অথচ মুখের মাঝে যেমন বোঁচা নাক তেমন করে বাড়িটা আছে।

নিরাঞ্জনাও বোঝে অনিকেত কী বলতে চায়। সত্যি সত্যিই বাড়িটার অবস্থা অত্যন্ত জীর্ণ। গত বছর তিনেক বারুই চাপেনি বলতে চাপতে সাহস করেনি। কখন ভস্‌কে যাবে বিপদ আপদ ঘটবে। তাছাড়া পুরোনো খড়ের চালে উই, বিছে ইত্যাদি অবাঞ্ছিত প্রাণীদের দাপট বেড়েছে।

সত্যি সত্যি পচে যাওয়া খড় থেকে বাঁশের বাতাগুলো উঁচু হয়ে আছে, ঠিক যেমন মাংসহীন পাঁজরার হাড়। ঘরখানার এমন অবস্থা দেখে বিজয়চাঁদের কথা মনে পড়ে নিরঞ্জনার। মানুষটা মরার আগে হাড় চামড়া সার হয়ে গিয়েছিল। বুকের পাঁজরগুলো স্পষ্ট গোনা যেত। মাথাটা মনে হত দেহের থেকে অনেক বড়ো। ঠিক যেন বাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে তারই প্রতিভূ হয়ে।

সাবেকি বাড়ি বলতে যা বোঝায়, বাড়িটা তেমনই। মস্ত মোটাসোটা দেওয়াল। কোঠা পাতা আর সামনে পরচালা, যাকে বারান্দা বলে। মেঝে ঘরের একটি দরজা, কোন জানালার বালাই নেই। বারান্দায় দু ফুট বাই দেড় ফুটের জানালা, যা দু-একটা টুকরো রড দেওয়া। যা দিয়ে শীর্ণকায় বেড়াল গলতে পারে মাত্র।

নিরঞ্জনার মনে আছে তার যখন বিয়ে হয় বিজয়চাঁদ তরতাজা যুবক। উচ্চতা সাড়ে পাঁচ ফুটের বেশি। পড়াশুনা যা শিখেছে তা দিয়ে নাটকের দল পরিচালনা করে। পাড়ার নাটক হলে সে নির্দেশক, সেই আসল অভিনেতা মানে হিরো। গায়ে গতরে জোরও অসম্ভব। বিজয়চাঁদের বিয়ে দিয়েছিল তার পিসি কৌরীবালা। তখন ছিটেবেড়া দেওয়াল আর খড় দেওয়া ঘরে সংসার শুরু করে বিজয়চাঁদ। ওখানে জন্ম হয় বিজয়চাঁদের প্রথম সন্তান আলোকলতার। তারপরে ভাল করে ঘর বাঁধার স্বপ্নটা পেয়ে বসে বিজয়চাঁদকে। বিজয়চাঁদ গা আর গতর দিয়ে শুরু করে নুন বাড়ি করার কাজ। মাঘ মাসে তিথি দেখে শুরু হয় ভিত খোঁড়া। তারপর দিনরাত রাতদিন স্বপ্নের মধ্যে চলে নির্মাণ। প্রতিদিন একটু একটু করে এগোতে থাকে কাজ। বিজয়চাঁদ নিজে মাটি কাটে, জল দিয়ে, মাটির ভিয়েন করে, মাটির মন্ড করে। দেয়ালের গাছে সাজিয়ে দেয় দ'দশ তিন'শ মন্ড। তারপর দক্ষ ঘরামির মতো দেওয়ালের উপর দেয়ালের নির্মাণ করে চলে নিরলহ। নিরঞ্জনা বসে থাকার পাত্রী নয়। সেও সর্বক্ষণ বিজয়চাঁদের পাশে পাশে থাকে। হাতের কাছে পৌঁছে দেয় যত জল লাগে। পৌঁছে দেয় তুঁঘ, টুকরো খড়। বিজয়চাঁদ বলে— 'তুই, এত খাটাখাটি করিস না বউ' তুই মেয়েটাকে সামলা, আমি দেখে নেবখান।'

নিরঞ্জনা বলে 'কই আমি আবার কি করলাম, ওই একটু একটু, এ আর এমন কী কাজ। তুমি পারো আর আমি পারি না বুঝি। আমিও চাষার বেটি খেয়াল রেখো।'

নিরঞ্জনা বোঝে মানুষটার দু'চোখে ঘুম নেই বোশেখ মাস পড়ার আগেই মাটির কাজ শেষ করতে হবে। একদিকে ঠা ঠা রোদ্দুর, অন্যদিকে কালবৈশাখির দাপট। জোষ্ঠি মাসের মধ্যে নতুন চাল বেঁধে খড় চড়াতে না পারলে প্রথম বর্ষা এসে গলিয়ে দেবে দেয়াল। এখানকার মাটি নয়ব নয়। সব কিছু ভেঙে মাটির সাথে মিশিয়ে দেবে।

নিরঞ্জনা বোঝে আজকের ভাঙাচোরা ঘরটা শুধুমাত্র আবর্জনা নয়। এটা বিজয়চাঁদের স্বপ্নের তাজমহল। এই মাটির গভীরে এখানে শুকিয়ে রয়েছে বিজয়চাঁদের নোনা ঘাম। পরিশ্রম, ভালোবাসা। নিরঞ্জনা দেখেছে গ্রীষ্মের বিজয়চাঁদের দেহ বেয়ে নেমে আসা ঘাম মাটির সাথে মিশে যেতে। অসাবধানতাবশতঃ শরীর ছিঁড়ে রক্ত মিশে গেছে মাটির সাথে। নিরঞ্জনা বার বার সাবধান করেছে। অভিমানের সুরে বলেছে—'এমন তাড়াহুড়ো করে কাজ করবেনা। আমার ভয় করে।' বিজয়চাঁদ বলে— 'ভয় কি বউ, আসলে কী জানিস, নতুন ঘর দোর কর, আর ব্রিজ কর, রাস্তা

কর, মাটি রক্ত চায়। না দিলে কাজই হবে না। আবার মাঝে মাঝে জীবনও চায়রে।' নিরঞ্জনা শিউরে ওঠে?– 'ও কথা মুখে এনো না আমি মরে যাবো।'

বর্ষা আসার আগেই নতুন ঘরে পা রেখেছিল বিজয়চাঁদ আর তার পরিবার। ততক্ষণে অনিকেত নতুন অতিথি হয়ে আসতে চাইছে। পাঁজি দেখে পুজো আর্চ্চা করে গৃহ প্রবেশ। পাড়া ঘরে পুজোর প্রসাদ বিতরণ, পায়েস বিতরণ ঘরে ঘরে। কিন্তু বছর না যেতেই বিজয়চাঁদের শরীরগৃহে রাজরোগ বাসা বাঁধলো। গলতে লাগলো বিজয় চাঁদের শরীর। পুড়তে লাগলো মন।

নিরঞ্জনা জেনেছে, অনুভব করেছে কে যেন বুকের ভিতর পাথর ভাঙছে। সে দেখতে পাচ্ছে একটা ভাঙা নোঙরহীন নৌকো তাকে অথৈ সমুদ্রে নিয়ে চলেছে। কিন্তু কিচ্ছুটি করার নেই। এ এক অনন্তযাত্রা।

ছেলে অনিকেতকে খুব কষ্ট করে বড় করেছে নিরঞ্জনা। অনিকেতের বাবা বিজয়চাঁদ মারা গিয়েছিল অনিকেতর বয়স যখন সবে দেড় বছর। নিরঞ্জনার বয়স কত আর হবে বাইশ-তেইশ। ওই বয়সে নিরঞ্জনার এক ছেলে এক মেয়ে। মেয়ে আলোকলতা আর ছেলে অনিকেতকে ফেলে পরপাড়ে পাড়ি দিয়েছিল বিজয়চাঁদ।

আসলে বিজয়চাঁদ কয়লাখনিতে কাজ করতো। হাতে হ্যারিকেন লণ্ঠন নিয়ে জল খাদের নীচে পাম্প খালাসীর কাজ। তখন কয়লাখনির ক্যাপল্যাম্পের প্রচলন হয়নি। নিরাপত্তা তার কোন প্রশ্ন আসেনা। সংসারে কাঁচা পয়সার অভাব মেটানোর জন্য কাজ নিতে হয়েছিল খাদানে। কিন্তু নিয়তি ছাড়েনি বিজয়চাঁদকে। টি বি তখন দুরারোগ্য। ওষুধ আবিষ্কার হয়নি। তারই শিকার বিজয়চাঁদ। তাই একরাশ অন্ধকারে বেহুলার ভেলা ভাসিয়ে মহাকালের পথে হারিয়ে গিয়েছিল বিজয়চাঁদ। তারপর কেটে গেছে কয়েক দশক। নিরঞ্জনা এক নিরবচ্ছিন্ন লড়াই চালিয়েছে একতরফা। কখনো ধান থেকে চাল করার কাজ, কখনো গৃহস্থের বাড়িতে মুড়ির জোগান দেওয়ার কাজ। আবার কখনো দুধেল গরুর দুধটুকু ভাদের জোগাড়ের জন্য তুলে দিয়েছে অন্যের সংসারে।

নিরঞ্জনা এখন দ্বিতল বাড়ির বাসিন্দা। সেকেলে কাঁচা বাড়ির গা ঘেঁষে বাড়ি তুলেছে অনিকেত। ওপর নীচ ছ'খানা ঘর, দু'দিকে বারান্দা, সিঁড়ি, ডাইনিং স্পেস। শুধু অতিথি আপ্যায়নের জায়গাটা ঠিকঠাক হয়নি। অনিকেতের ইচ্ছে মাটির কাঁচা বাড়িটা সারিয়ে ওখানেই মারবেল দিয়ে একটা বিলাসি বসার জায়গা বানাবে। তা যখনই হোক। এ নিয়ে মা নিরঞ্জনাকে বহুবার বলেছে– 'মা দেখো...।' নিরঞ্জনা পাশ কাটিয়ে গেছে– 'একদিন তো হবে খোকা; থাকনা য'দিন থাকছে বাড়িটা।'

বিজয়চাঁদের সব কথা এখন আর মনে পড়ে না নিরঞ্জনার । তবু চার দশকের ভাঙা ঘরটাই বিজয়চাঁদ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর নিরঞ্জনা প্রতিদিন শুতে যাওয়া একটা অভ্যাসে জিইয়ে রেখেছিল। ভিতরের দেওয়ালগুলো খসে পড়লেও বারান্দাটার অনেকখানি ব্যবহার করার মত করে রেখেছিল নিরঞ্জনা। ছেলে অনিকেত বলে– 'মা এত বড় বাড়িটায় তোমার শোবার জায়গা হয়না। কবে কী বিপদ ঘটাবে তুমিই জানো।' নিবঞ্জনা বলে– 'নারে খোকা, খড়ের ঘরের ছায়ার এক মিষ্টতা আছে, মাটির মেঝেতে মাদুর পেতে শোয়ার মধ্যে স্বপ্নসুখ আছে। আমার বেশ লাগে।'

দুপুরের দিকটা ওখানেই কাটায় নিরঞ্জনা। মনে হয় বিজয়চাঁদ তার পাশে পাশেই রয়েছে। প্রতিদিন দেওয়ালের গায়ে সে কালো দাগটা খোঁজে, যেখানে প্রতিদিন সরষের তেল মেখে ঠেস দিয়ে বসতো বিজয়চাঁদ। দীর্ঘদিন তেলের পর তেল পড়তে পড়তে কালো আকার নিয়েছে জায়গাটা। আজও সেই জায়গাটা অমলিন রয়ে গেছে। এখনো বিজয়চাঁদের কেনা ভাঙা ছাতাটা বিয়ের বাক্সের মধ্যে থেকে গেছে। এখনো সেই ভাঙাচোরা হ্যারিকেনটা টাঙানো আছে চিলেকোঠায়। বটগাছটা আছে রাস্তা জুড়ে, শুদু মানুষটা নেই। তবু সারা বাড়িময় তার গন্ধ খুঁজে পায় নিরঞ্জনা। যে কথা বুঝতে চায় না অনিকেত, অনিকেতের বউ রণিতা, আর তার ছেলেমেয়েরা।

আজ বাড়িটা ভাঙতেই বিজয়চাঁদের মৃত্যুর দিনটা নাড়া দেয় নিরঞ্জনাকে। যেমন করে স্বামীর মৃত্যুটা তাকে পাথর করে দিয়েছিলো ঠিক তেমনি করে আজ অল্পক্ষণের জন্য বিহ্বল হয়ে পড়েছিল নিরঞ্জনা। তারপর সামলে নিয়েছিল নীরবে।

পরের দিন যখন ভাঙা বাড়ি সাফ সুতরো হচ্ছিল, নিয়ে যাওয়া হচ্ছি দূরে কোথাও নিরঞ্জনার কেবলই মনে হচ্ছিল, এটাই বুঝি বিজয়চাঁদের অন্তিম যাত্রা।